দৈনিক মাধুকর
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে অবিচল
news portal: www.madhukar.news
www:emadhukar.com

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৫

“প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি”

SKS

বিশেষ ক্রোড়পত্র

এসকেএস ফাউন্ডেশন

শুভেচ্ছা বার্তা

আজ ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতার প্রসার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা সমুন্নতকরণ, অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নতি সাধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পালিত হয় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে এই দিবস পালিত হয়ে আসছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে দিবসটি জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবেও পালন করা হয়। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের জাতিসংঘ ঘোষিত এবারের প্রতিপাদ্য ‘Fostering disability inclusive for advancing social progress’ বাংলায় ‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’।

পথেঘাটে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে প্রতিবন্ধিতা মানে শারীরিক অসম্পূর্ণতা। তবে প্রতিবন্ধিতার একাধিক ধরণ হতে পারে। প্রতিবন্ধিতা হতে পারে শারীরিক, মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তীয়, দৃষ্টিজনিত, বাক ও শ্রবণজনিত কিংবা বহুমাত্রিক। প্রতিবন্ধিতা কোনো প্রতিষেধক না থাকলেও আছে প্রতিরোধের উপায়। সুতরাং প্রতিরোধের জন্য প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। দুর্ঘটনাজনিত কারণে মানুষ বয়সের যে কোনো স্তরে প্রতিবন্ধী হতে পারে।

অনেক কারণে শিশুরাও প্রতিবন্ধী হতে পারে। প্রতিবন্ধী হওয়ার যেসব কারণ আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, সেগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা প্রতিবন্ধিতা রোধ করতে পারি। এজন্য প্রতিবন্ধিতার কারণগুলো যেমন জানতে হবে, তেমনি তা ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শণ ও তাদের কর্মকান্ডের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই এই দিবসটির সূচনা। প্রতিবন্ধী মানুষেরা যাতে সমাজে অবহেলিত না থাকে, সে উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ সবক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সমঅধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে প্রতিবন্ধী বান্ধব সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের প্রত্যাশা।

এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সহানুভুতিশীল। এসকেএস বিশ্বাস করে প্রতিবন্ধীদেরও সমাজের আর অন্য দশজন মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। তাই তাদের কোন রকম অবহেলা না করে মানুষ হিসেবে তাদের সকল অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবন্ধীবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যারা শারীরিক অক্ষমতাজনিত প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য স্বল্পমূল্যে উন্নত ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান করে যাচ্ছে এসকেএস। গাইবান্ধায় একাধিক ফিজিওথেরাপি সেন্টার পরিচালনার মাধ্যমে জেলার প্রতিবন্ধী মানুষকে স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। মানবিক দিক বিবেচনা করে এসকেএস ফিজিওথেরাপি সেন্টার দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খুব কম খরচে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদান করছে।

সচেতনতার প্রসারে এসকেএস প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার দান, গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার না করা, ন্যূনতম যোগ্য প্রতিবন্ধীকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ দেয়া, গণপরিবহনে পাঁচ ভাগ আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত করাসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান সুযোগ ও অধিকার বিষয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

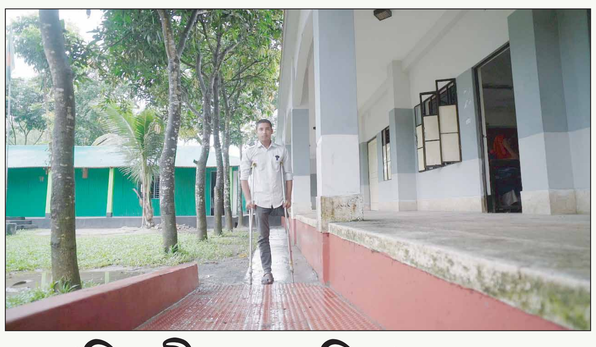

প্রতিবন্ধীদের অধিকার এবং সমাজের দায়বদ্ধতা

আফরুজা বুলবুল

গাইবান্ধার একটি দুর্গম চরে ভ্যানচালক কামাল ও তার স্ত্রী আঁখির বাস। প্রথম সন্তান আসার খবরে আনন্দে ভরে ওঠে তাদের ছোট্ট সংসার। গর্ভাবস্থায় আঁখির যত্ন নিতে থাকেন কামাল। অবশেষে তাদের ঘরে জন্ম নেয় এক কন্যাশিশু। কিন্তু শিশুটির একটি পা। শিশুটির নাম দেন আশা। জন্মের পর থেকেই প্রতিকূলতা পেরিয়ে বড় হতে থাকে শিশুটি। হেঁটে ভাঙ্গাচোরা রাস্তা-খাল পেরিয়ে স্কুলে যাওয়া, বই হাতে মাইলের পর মাইল হাঁটা, দুইতলা ভবনে ওঠা- সবই তার জন্য একেকটি যুদ্ধ। কোন কিছুই তাকে থামাতে পারেনি। আঁখি স্বপ্ন দেখেন, একদিন তার মেয়ে স্কুল শিক্ষক হবে।

সুন্দরগঞ্জের আরেক চর এলাকায় ৮ম শ্রেণির ছাত্র রিজন। ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে পায়ে আঘাত ও ভুল চিকিৎসার কারণে এখন শারীরিক প্রতিবন্ধী সে। প্রতিদিন এক হাতে ক্র্যাচ, অন্য হাতে বই-খাতা নিয়ে উঁচু বারান্দা ও সিঁড়ি ভেঙে ক্লাসে পৌঁছানো তার নিত্যদিনের সংগ্রাম। স্কুলের শৌচাগার প্রতিবন্ধী-বান্ধব না হওয়ায় তাকে আরও দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

পরিস্থিতির পরিবর্তন আসে মুসলিম এইড ইউকে বাংলাদেশ ফিল্ড অফিসের অর্থায়নে এবং এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর বাস্তবায়নে School-led Community Resilience to Disaster and Climate Risks (SLCRDCR-II) প্রকল্পের মাধ্যমে। রিজনের স্কুলে নির্মাণ করা হয় র‍্যাম্প, স্থাপন করা হয় প্রতিবন্ধী-বান্ধব WASH ব্লক। এতে রিজনের মতো অনেক শিক্ষার্থীর স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়।

একইভাবে, ৩ বছর আগে দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে প্রতিবন্ধিতা বরণ করে রুপালি। রুপালিও এই প্রকল্পের সহায়তায় স্কুলে পুনরায় ফেরার সুযোগ পায়। তার স্কুলে PWD-friendly অবকাঠামো গড়ে ওঠায় সে এখন নির্ভরতার সাথে ক্লাসে অংশ নেয়। এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর সরবরাহ করা হুইলচেয়ার ব্যবহার করে এখন রুপালি স্কুলের উঁচু ভবনে র‍্যাম্প বেয়ে সহজেই উঠতে পারে; আগের মতো কষ্ট করতে হয় না। পড়াশোনা করে সে নিজেকে ভবিষ্যতে একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দেখতে চায়। এই ছোট্ট প্রাণ নিজেকে আর বোঝা মনে করে না; বরং বহু মানুষের ভরসার স্থানে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখে রুপালি। রুপালির পরিবারের ভাষায়, “এ সহায়তা তাকে নতুন জীবন দিয়েছে”।

উপরোল্লেখিত প্রত্যেকের সংগ্রাম প্রমাণ করে, তারা অক্ষম নয়, সমাজ তাদের জন্য পথ তৈরি করে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দয়া নয়, সুযোগ চান। একজন মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। অভিভাবকদের উচিত শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা, বিশেষ শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা। শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি, উপযোগী মূল্যায়ন ও সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। সমাজকে কুসংস্কার ভেঙে সুযোগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। আর উন্নয়নকর্মীদের ডেটাভিত্তিক পরিকল্পনা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রবেশগম্য অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের একটি জেলার দুইটি চর অঞ্চলের বাস্তবতা যদি এমন হয়, তাহলে জাতীয় প্রতিবন্ধী ডাটাবেইস কত বড় হতে পারে-তা কল্পনা করা কঠিন নয়। প্রয়োজন শুধু সহযোগিতার হাত আর অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব। প্রতিবন্ধী মানুষরা আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ-তাদের এগিয়ে নিতে পারলেই এগোবে দেশ।

উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে বিশ্বে প্রতি ৬ জনে ১ জন কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর NSPD-২০২১ অনুযায়ী দেশে প্রায় ৪-৬% মানুষ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জীবনযাপন করেন। HIES ২০২২ জরিপে এই হার ৫.৭১%; যা লাখ লাখ মানুষের জীবনে সুযোগ ও অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

লেখক: উন্নয়ন কর্মী।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস ও প্রতিবন্ধী মানুষের চ্যালেঞ্জ

সুলতান উদ্দিন আহমেদ

প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে দিবসটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলেও এর পেছনে রয়েছে একটি মানবিক ইতিহাস। ১৯৫৮ সালে বেলজিয়ামের ভয়াবহ খনি দুর্ঘটনায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়ে আজীবন প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। তখন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে এগিয়ে আসে। এর পরের বছর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে তথ্যভিত্তিক ধারণা ও নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উত্থাপিত হয়। সেই সম্মেলনে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সম্মান ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালন করে। দিবসটিকে কেন্দ্র করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান, আলোচনা সভা এবং প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবন্ধিতা বলতে দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততাকে বোঝায়; যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধার কারণে তার সমঅংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

সমন্বিত শিক্ষার মাধ্যমে মূলধারার বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী পাঠদান নিশ্চিত করা সম্ভব। কারণ শিক্ষার অভাব তাদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় শারীরিক বা বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী তরুণরা বড় ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এ লক্ষ্যেই টঙ্গীতে ১৯৭৮ সালে স্থাপিত হয় ইআরসিপিএইচ (ERCPH), যা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ, কৃত্রিম অঙ্গ নির্মাণ, ব্রেইল প্রেস, হিয়ারিং এইড সার্ভিস এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ৩,২০০-এর বেশি প্রতিবন্ধী মানুষকে পুনর্বাসিত করেছে।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী মানুষের উচ্চ হার সম্পন্ন দেশগুলোর একটি। BBS (২০১১) অনুযায়ী দেশে প্রায় ১১.৪ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। ২০২১ সালের জাতীয় জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার ২.৮০% মানুষ প্রতিবন্ধী। সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ (২০১৩) বিস্তৃত তথ্যভান্ডার তৈরি করেছে, যা বিশ্বের অল্প কয়েকটি দেশে দেখা যায়। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশে শনাক্ত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৩,০৩৪,৫৩৯ জন। অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, দৃষ্টি ও বাক প্রতিবন্ধিতা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রধান সমস্যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কুসংস্কার। অনেক পরিবার ও সমাজ এখনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বোঝা হিসেবে দেখে। তাদের সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। শ্রম-মজুরিতে বৈষম্য, চাকরিতে অগ্রাধিকার না পাওয়া, ব্যবসায় অংশীদার হতে না দেওয়া- এসব কারণে তারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকেও অনেক সময় তারা বঞ্চিত হয়; কারণ কিছু স্বাস্থ্যসেবিকা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এখনও প্রতিবন্ধী রোগীকে সেবা দিতে অনিচ্ছুক।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যকে মানবাধিকার সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক অংশগ্রহণ- সবক্ষেত্রেই তারা উদ্বেগজনকভাবে পিছিয়ে। তাই পুনর্বাসনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করা, তার সর্বোচ্চ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও পেশাগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত করা।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ (CRPD) অনুসমর্থনকারী প্রথম দেশগুলোর একটি। সনদের ১১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুর্যোগ বা মানবিক সংকটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের দায়িত্ব। ইতিমধ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ভাতা প্রদান, শিক্ষা সহায়তা, পুনর্বাসন ও কারিগরি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এসব উদ্যোগ সমাজকে আরও অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সহায়তা করছে।

তবে বাস্তবতা হলো প্রতিবন্ধী মানুষ এখনো প্রান্তিক। অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে করুণা ও দান-অনুদান নির্ভর ভাবনা তাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ পরিস্থিতি পরিবর্তনে প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, বৈষম্যহীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিবন্ধী মানুষের মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অংশগ্রহণ।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করার দিন। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সমাজ ও পরিবারের সক্রিয় সহযোগিতা থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ ও সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

লেখকঃ সাবেক উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নির্মাণে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

মোঃ আখতার হোসাইন

জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী দিবস প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, মর্যাদা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। দিবসটির লক্ষ্য হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং তাদের প্রতি সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষাধিক মানুষ কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতায় ভুগছেন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯.১% (উৎস: জাতীয় প্রতিবন্ধী জরিপ ২০২৪, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)। প্রতিবন্ধিতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- জন্মগত ত্রুটি, অপুষ্টি, দুর্ঘটনা, দারিদ্র্য, মাতৃকালীন স্বাস্থ্যঝুঁকি, সংক্রমণজনিত অসুস্থতা এবং পরিবেশ দূষণ।

বাংলাদেশে স্বীকৃত ১২ ধরণের প্রতিবন্ধিতা:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতার ১২টি ধরণ হলোঃ ১. অটিজম: স্নায়ু-বিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা, যা সামাজিক যোগাযোগ, আচরণ ও কার্যকলাপে ভিন্নতা সৃষ্টি করে। অনেকে ছবি আঁকা, গান করা বা গণিত সমস্যায় বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারেন। ২. শারীরিক প্রতিবন্ধিতা: চলাফেরা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতায় সীমাবদ্ধতা। ৩. মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা: মানসিক স্বাস্থ্যগত অবনতি বা মানসিক রোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা। ৪. দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা: আংশিক বা সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীনতা। ৫. শ্রবণপ্রতিবন্ধিতা: আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে শুনতে না পারা। ৬. বাকপ্রতিবন্ধিতা: কথা বলা বা সঠিকভাবে যোগাযোগে সমস্যা। ৭. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা: শেখা, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমাবদ্ধতা। ৮. শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি উভয়ের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি। ৯. সেরিব্রাল পালসি: মস্তিষ্কের রোগজনিত কারণে চলাফেরা ও শারীরিক সমন্বয়হীনতা। ১০. ডাউন সিন্ড্রোম: জেনেটিক অবস্থা, যা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে প্রভাব ফেলে। ১১. বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা: একাধিক প্রতিবন্ধিতার সমন্বয়। ১২. অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা: উপরোক্ত কোনোটির বাইরে আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা। সব ধরণের প্রতিবন্ধিতাই মানুষের জীবনযাত্রা, কর্মক্ষমতা ও সামাজিক অংশগ্রহণে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে।

প্রতিকার, চিকিৎসা ও সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা: প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন মাতৃত্বকালীন সেবা, সময়মতো টিকাদান, পুষ্টিকর খাবার, জন্মের পর শিশুর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ-চিকিৎসা প্রতিবন্ধিতা অনেকাংশে প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা এবং শ্রমিক নিরাপত্তা শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কমাতে সহায়ক।

সঠিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পেলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে স্বাভাবিক নাগরিক হিসেবে অবদান রাখতে পারেন। এ লক্ষ্যে সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে; যা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের (JPUF) অধীণে পরিচালিত। গাইবান্ধা জেলাতেও এই কেন্দ্র থেকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, শ্রবণপ্রতিবন্ধী, শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিবন্ধন, পরামর্শ, সহায়ক উপকরণ বিতরণ, পুনর্বাসন ও কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে NDDC, CRP, পঙ্গু হাসপাতাল, এবং জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি ও সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

সেবা গ্রহণকারীর ভূমিকা ও সেবা প্রদানকারীর করণীয় : প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা শুধু দয়া নয়, এটি অধিকারভিত্তিক সামাজিক দায়িত্ব।

সেবা গ্রহণকারীর করণীয়: নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া; সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন; প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও সুযোগ গ্রহণ; আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন।

সেবা প্রদানকারীর করণীয়: আন্তরিকতা, পেশাগত দক্ষতা ও সংবেদনশীলতার সাথে সেবা প্রদান; দাতব্য নয়, বরং অধিকার ও মর্যাদার নীতিতে সেবা নিশ্চিত করা; প্রয়োজনীয় আদেশ, নীতিমালা, নির্দেশনা বাস্তবায়ন; সহায়ক উপকরণ সহজলভ্য করা; বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের CSR মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা।

পরিবার, সমাজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের ইতিবাচক ভূমিকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাফল্য, সীমাবদ্ধতা, প্রযুক্তির ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য: বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী সেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। যেমন- ডিজিটাল ব্রেইল বই ও স্ক্রিন রিডার; সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রশিক্ষণ; হুইলচেয়ার, ট্রাইসাইকেল, স্মার্ট ছড়ি, ওয়াকার বিতরণ; প্রযুক্তি-সহায়ক শিক্ষা। তবে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন-নীতিমালা বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল সংকট; পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব; প্রশিক্ষণের অভাব; সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব।

প্রযুক্তিনির্ভর সেবা যেমন: প্রতিবন্ধীবান্ধব ওয়েবসাইট, অডিও বই, Voice-to-text অ্যাপ, অনলাইন প্রশিক্ষণ, টেলিমেডিসিন- এসব আরও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান: দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবন্ধী সেবা খাতে বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা কিছু ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর। ভারতের আইন অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে ৪% কোটা এবং নেপালে ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসিং মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ২০১৩ সালের আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে আরও জোর দিতে হবে।

সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন: জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গাইবান্ধায় সমাজসেবা কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য বিভাগ, টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সমবায় বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন বিভাগ ও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগ যৌথভাবে কাজ করলে দক্ষতা উন্নয়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন ও সচেতনতা কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা সম্ভব হবে।

উপসংহার: অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ শুধু নীতি নয়, এটি মানবিক দায়িত্ব। উন্নয়নের মূলনীতি হলো- কাউকেই পিছিয়ে রাখা যাবে না। সমন্বিত উদ্যোগ, মানবিকতা, প্রযুক্তি ও নীতি-বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজই আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হওয়া উচিত। ***লেখকঃ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।***

অনুভূতির ময়নাতদন্তঃ সিনেমার ভুবনে দৃষ্টিহীন যাত্রা

ইফতেখার মাহমুদ

সিনেমা নাকি মানুষের জীবন্ত দর্পণ। মনোগ্রাহী করে তুলে ধরে আমাদের জীবনের হাসি-কান্না, রহস্য ও সাদামাটা কতশত অবিশ্বাস্য গল্প গাঁথা। দু-তিন ঘন্টার রঙ্গিন দুনিয়াকে দেখে মাঝে মাঝে জীবনকে মনে হয় আরো বেশি ভালোবাসি, বিপ্লবী হয়ে দুনিয়াকে কাপিয়ে দিই, আরো একবার প্রেম করতে পারলে মন্দ হতো না! সিনেমার সার্বজনীনতা সকলকেই টানে, এমনকি ক্রমশ চোখের আলো হারিয়ে ফেলা আমার মতো মানুষও সিনেমার স্বাদ পেতে চায়।

বাসায় টিভি আসে ১৯৮৭ সালে। তাই ছোটবেলা থেকেই সিনেমার সাথে পরিচয় ঘটেছে। সিনেমা দেখার জন্য মনটা আনচান করতো, কবে আসবে সেই শুক্রবার। মাসে একবার মুভি অব দ্যা উইক হতো। সেখানে হলিউডের সিনেমা দেখাতো। দারুন সব সিনেমা, বেনহুর, ক্লিওপেট্রা, ৭৭ ডেস এরাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড। ইরানী সিনেমার বাংলা ডাবিং দারুন লাগতো। মি: এন্ড মিসেস জুজু, চিলড্রেন্স হ্যাভেন। আবার প্রতিবার সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে সপ্তাহ জুড়ে সার্কভুক্ত সব দেশের সিনেমা দেখানো হতো। কেবল হিন্দি দুটি সিনেমার কথা মনে আছে কার্মা ও পার। বিটিভি- এর আমলের দুটি সিনেমা কখনো পুরনো হয়নি; একটি জীবন থেকে নেয়া, আরেকটি ইরানিয়ান ডাবিং সিনেমা ম্যাসেঞ্জার। প্রতি ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১০ মহর্রম উপলক্ষে দেখাতো।

অডিটরিয়ামে প্রথম সিনেমা দেখি বন্ধু কামালের সাথে ২০০২ সালে টিএসসিতে ‘দর্পচূর্ণ’। তাছাড়া ক্যাম্পাসের বাইরে প্রথম সিনেমা দেখা হয় বাইসাইকেল নিয়ে জার্মান কালচারাল সেন্টারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ